ভাষা আন্দোলনভিত্তিক সাহিত্যে রাজনৈতিকতা ও রাষ্ট্রকল্প: *কবর* ও *আরেক ফাল্গুন*

মোহাম্মদ আজম

DOI: https://doi.org/10.69862/carass2025LMBookAzam

১

জাতীয়তাবাদী উপাদান হিসাবে ভাষা আন্দোলনের গভীর কার্যকরতার এক অব্যবহিত প্রমাণ এই যে, শিল্পকলার জগতে ঘটনাটি যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিল। এ বিষয়ে প্রবন্ধ রচিত হচ্ছিল আগে থেকেই, আর একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনার পরে কথাসাহিত্য, নাটক, কবিতা, গান ও চলচ্চিত্রে বিচিত্রভাবে ওই ঘটনার ছায়া পড়তে থাকে। জাতীয় রাজনীতিতে ঘটনাটি যে খুব প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ চুয়ান্নর নির্বাচনের একুশ দফা। ওই নির্বাচনী ইশতাহারের বেশ কয়েকটি দফা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভাষা আন্দোলনকে ঘিরে রচিত হওয়ায় প্রমাণিত হয়, ঘটনার অনতিবিলম্বে এটি জাতীয় চৈতন্যের অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। সাহিত্যে তার যে নানামাত্রিক প্রতিফলন ঘটবে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

কোনো ঘটনা, ইতিহাস বা রাজনৈতিক তৎপরতার সাহিত্যিক রূপায়ণ সাধারণভাবে কিছু অতিরিক্ত মাত্রা স্পর্শ করে। সাহিত্যে একদিকে কাঠামোগত বাস্তবতার সাপেক্ষে ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের অন্তরঙ্গ উন্মোচন ঘটে, অন্যদিকে পুরো প্রক্রিয়াটি সংঘটিত হয় ভাষার আধারে, যে ভাষা জনগোষ্ঠীর ব্যষ্টিক-সামষ্টিক যাপিত জীবনের প্রধান প্রকাশ। সাহিত্যিক ভাষা তার সামগ্রিক রূপ বা ফর্মের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত। রূপের আধারে কাঠামোভুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের যাপিত জীবনের যে অন্তরঙ্গতা সঞ্চারিত করা সম্ভবপর হয়, তা উদাহরণ হিসাবে বলা যাক, ইতিহাস বা সমাজবিজ্ঞানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুরূহ হয়ে ওঠে। ভাষার যে ব্যঞ্জনা বা বহু-অর্থকতা সাহিত্যের সহজাত, তার ভিত্তিতেই একদিকে জীবনযাপনের অন্তরঙ্গ কোণগুলোতে আলো ফেলা সম্ভবপর হয়, অন্যদিকে বর্তমানময়তার ভাঁজে ভাঁজে এঁকে দেওয়া সম্ভব হয় ভবিষ্যতের ইশারা ও আকাঙ্ক্ষার মানচিত্র। সাহিত্যিক রূপকল্পে জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিকতা বা রাষ্ট্রকল্পের মতো সামষ্টিক মননের উপকরণ শনাক্ত করা এ কারণেই অন্যরকম তাৎপর্য বহন করে। রূপকল্প ও ভাষার নন্দনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সামষ্টিক মনে ক্রিয়াশীল ভাবনা-বোধির তুলনামূলক বিশদ ও গভীর উন্মোচন সম্ভব।

উল্লিখিত তত্ত্ব-কাঠামোর ভিত্তিতে ভাষা আন্দোলনের রাজনৈতিকতা ও রাষ্ট্রকল্পের কিছু অন্তরঙ্গ ছবি আমরা অনুসন্ধান করব ভাষা আন্দোলনভিত্তিক সাহিত্যকর্মের আধারে। সম্ভাব্য অনেকগুলো বিকল্প থেকে এখানে আমরা বেছে নিয়েছি মুনীর চৌধুরীর নাটিকা '*কবর*' (১৯৫৩) এবং জহির রায়হানের উপন্যাস '*আরেক ফাল্গুন*' (১৯৬৯)। এগুলো বেছে নেওয়ার অন্যতম কারণ, দুটি রচনাই নিজ গুণে বহু-পঠিত এবং বিশ্লেষিত। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আবির্ভাবের পেছনে ক্রিয়াশীল যে জাতীয়তাবাদী গল্প প্রায় সর্বব্যাপী স্বীকৃতি পেয়ে আসছে, তার সাপেক্ষে এ দুই টেক্সটের জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতার বিশেষ গুরুত্ব আছে। জনপ্রিয়তাই প্রমাণ করে, এ দুই গ্রন্থে উপস্থাপিত ভাষা আন্দোলন অন্তত মূলধারার বয়ানকে যথেষ্ট পরিমাণে ধারণ করে। কিন্তু

জাতীয়তাবাদী বয়ান সাধারণভাবে চলে বেশ উপরিতলে, তুলনামূলক দৃশ্যমান স্তর থেকেই সে তার সুবিধাজনক উপাদানগুলো সংগ্রহ করে নেয়। সাহিত্যিক ভাষা ও রূপকল্প সাধারণত যাপনের যেসব সূক্ষ্ম স্তরে ক্রিয়াশীল হয়, জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী আখ্যান সে পর্যন্ত পৌঁছাতে চায় না। এ দুই টেক্সটের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। বিশেষত, বর্তমান রচনায় এ দুটো টেক্সট যে বিশেষ প্রেক্ষাপট ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষিত হবে, তার সমরূপ নজির পূর্বতন পাঠে বা সমালোচনায় দেখা যায় না। তাহলে একদিকে দুটি টেক্সটের জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে, এদের বহিঃকাঠামোয় প্রতিফলিত ঘটনা ও ইশারা জাতীয়তাবাদী সিদ্ধরসকে লঙ্ঘন করে না; অন্যদিকে সাহিত্যিক ভাষা ও রূপকল্পে সঞ্চারিত অন্যতর তাৎপর্যের সম্ভাবনাও তাতে পূর্ণমাত্রায় হাজির।

কিন্তু এ দুটো সাহিত্যকর্ম বেছে নেওয়ার এটাই একমাত্র কারণ নয়। *কবর* নাটক রচিত হয়েছিল ১৯৫৩ সালে, ভাষা আন্দোলনের ঠিক পরের বছর, যখন ঘটনার অব্যবহিত তাপ-ভাপ এবং সামষ্টিক মনস্তত্ত্বে জায়মান ঝোঁক ও প্রবণতা বেশ পরিমাণে তাজা ছিল। ষাটের দশকের ঘটনাপ্রবাহ যেভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রাম ও মনোবৃত্তিকে একমুখী করে ঘনীভূত করেছিল, ১৯৫০-এর দশকের গোড়ায় তা একেবারেই অভাবনীয় ছিল। এমতাবস্থায় *কবর* নাটকে ভাষা আন্দোলনের অব্যবহিত অভিজ্ঞতার এমন ছাঁচ ও প্রবণতা মুদ্রিত হওয়া স্বাভাবিক, যা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রত্যক্ষ চাপে বিবর্তিত হয়নি। সেদিক থেকে এমনকি তথ্য-উপাত্তের চেয়েও এ টেক্সটের সাক্ষ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে অধিকতর নির্ভরযোগ্য হওয়ার কথা।

অন্যদিকে, *আরেক ফাল্গুন* রচিত হয়েছে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তুলনামূলক পরিপক্ব অবস্থায়, আন্দোলন-সংগ্রামের প্রত্যক্ষ আঁচে বসে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন জাতীয়তাবাদের প্রধান চিহ্ন হিসাবে পরিগঠিত হওয়া তখন একপ্রকার নিশ্চিত। আর এ ধরনের পরিস্থিতিতেই ১৯৬৯ সালে জহির রায়হান ১৯৫২-র অপেক্ষাকৃত বলীয়ান রেপ্লিকা হিসাবে উপস্থাপন করেছেন ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারি-উদ্‌যাপনকে, যেখানে 'আসছে ফাল্গুনে দ্বিগুণ হওয়ার' প্রত্যয় নিঃসন্দেহে ১৯৬৯-এর সম্ভাবনাকেই প্রত্যয়ন করে, যে সম্ভাবনা উপন্যাসটির রচনাকালে অনেকটাই বাস্তব হয়ে উঠেছে। কাজেই এ টেক্সটে রাজনৈতিকতা ও রাষ্ট্রকল্প যে নতুন তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয়ে তুলনামূলক একরোখা বাঁক নেবে, তাতে কোনো সন্দেহ নাই। *কবর* ও *আরেক ফাল্গুন* এভাবে পাকিস্তান আমলের প্রায় পুরো সময়টিকে একদিক থেকে চিহ্নিত করে এবং রাজনৈতিকতা ও রাষ্ট্রকল্পের তুলনামূলক প্রসারিত মানচিত্র প্রণয়নের সুযোগ তৈরি করে।

ব্যক্তি-লেখকের দিক থেকে *কবর* এবং *আরেক ফাল্গুন*-এর অন্যতর গুরুত্বও আছে। দু'জন লেখকই বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অংশীদার। দু'জনই এ বাবদ রাষ্ট্রপক্ষের জুলুম ও নিপীড়নের শিকার। মুনীর চৌধুরী ১৯৫২ সালে ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক থাকাকালে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সভায় একুশে ফেব্রুয়ারির 'হত্যাকাণ্ডের সমালোচনা করে বিবৃতি পাশ করানোর অভিযোগে' কারাবরণ করেন (ইসলাম, ১৯৭২, পৃ. ১৭-১৮)। জহির রায়হান বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনে একশ চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গকারী দশজনের প্রথম দলের সদস্য হিসাবে গ্রেফতার হন (আহমদ, ২০২০, পৃ. ৮০); আবার পঞ্চান্নর 'আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী এবং গ্রেফতারকৃত ছাত্রদেরও তিনি একজন (ইসলাম, ২০১৬, পৃ. ৩৪)। তদুপরি, 'জহির রায়হান সম্ভবত বাংলাদেশের একমাত্র কথাসাহিত্যিক, যাঁর উদ্ভবের পেছনে আছে বায়ান্নোর ভাষা-আন্দোলন, যাঁর স্বপ্ন কল্পনা জীবন ভরে আছে ভাষা-আন্দোলনের স্মৃতি ও দ্রোহে' (আজাদ, ২০১২, পৃ. ২৭৫)। কাজেই তাঁদের সাহিত্যিক বয়ানের অন্তরঙ্গতায় ঘাটতি থাকার সম্ভাবনা নিতান্তই কম।

বর্তমান প্রবন্ধে 'রাজনৈতিকতা' কথাটা ব্যবহৃত হয়েছে বহিঃস্তরে রাজনৈতিক তৎপরতা আর অন্তঃস্তরে ক্ষমতা-সম্পর্কের প্রতিশব্দ হিসাবে। রাজনৈতিকতার কোনো কোনো দিক তৎপরতা হিসাবে উপরিতলে প্রকাশিত হয়। রাজনৈতিক দল-গঠন, কর্মসূচি প্রণয়ন ও কর্মসূচি বাস্তবায়নজনিত তৎপরতা এ স্তরে পড়বে। কিন্তু এর অনেক গভীরে; রাজনৈতিক তৎপরতার কার্যকারণ হিসাবে– অন্তঃস্তরে ক্রিয়াশীল থাকে ক্ষমতা-সম্পর্কের নানা রূপ। বিদ্যমান ক্ষমতাতন্ত্র এবং নতুন ক্ষমতার প্রস্তাব– এ দু'য়ের দ্বৈরথ গভীরভাবে শনাক্ত করা যায় ভাবাদর্শিক স্তরে তল্লাশি চালালে। জনগোষ্ঠীর সামষ্টিক অস্তিত্বের চিহ্ন হিসাবে তা প্রকাশিত হয় নানামাত্রিক ভাষিক চিহ্ন-ব্যবস্থায়। কথা বলার ভাষা তার এক প্রকাশ মাত্র। অন্য অনেক মাত্রা প্রকাশিত হয় সামগ্রিক মানব-সম্পর্কে। একে বলতে পারি ভাষার তুলনামূলক গভীর স্তর। সাহিত্য বস্তুত কাজ করে এ স্তরের চিহ্নায়ন, সূত্রায়ন ও আকার দেওয়ার মধ্য দিয়ে। প্রত্যক্ষত রাষ্ট্রকল্প উপস্থাপিত না হলেও ভাষার এ স্তরে অনুসন্ধান করলে বিদ্যমান রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় অসন্তোষ ও কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্র-কাঠামোর সম্ভাবনার দিকগুলো উন্মোচিত হয়। ভাষিক চিহ্নে এ ভাবাদর্শিক অবস্থান মুদ্রিত থাকে।

সাহিত্যিক ভাষা ও রূপ চিহ্ন-ব্যবস্থা হিসাবে পঠিত হওয়ার সুযোগ প্রবল। উচ্চারণের ঝোঁক ও বাগ্‌বিধিগত তাৎপর্য বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে দেখানো সম্ভব যে, বিদ্যমান ক্ষমতা-সম্পর্ককে নানা মাত্রায় চ্যালেঞ্জ করে রচনা-দুটি রাজনৈতিকতা ও রাষ্ট্রকল্পের অন্তর্লীন কিন্তু শক্তিশালী রূপরেখা প্রণয়ন করে। সাহিত্যপাঠের বিবিধ কায়দাকানুন ও সাহিত্যিক ভাষার অর্থ-উৎপাদন-কৌশল পরীক্ষা করার পাশাপাশি ডিসকোর্স এনালাইসিসও এ কাজে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। চিন্তাভাবনার যেসব অন্তর্নিহিত ঝোঁক ভাষার প্রকাশ্য স্তরে মুদ্রিত হয়ে গভীর অন্তর্দেশের বার্তা বহন করে, প্রধানত সেগুলো উন্মোচনের মাধ্যমেই রাজনৈতিকতা ও রাষ্ট্রকল্পের রূপরেখা প্রণীত হতে পারে।

২.১

সাধারণভাবে রাজনৈতিক তৎপরতা বলতে আমরা যা বুঝি, *কবর* নাটকে তার প্রত্যক্ষ হাজিরার সুযোগ সীমিত। তবে গোরস্থানে মঞ্চস্থ দৃশ্যাবলির ফাঁকে ফাঁকে নাট্যকার সূক্ষ্ম মুনশিয়ানায় একুশে ফেব্রুয়ারির পুরো ঘটনাই সংক্ষেপে উপস্থাপন করেছেন। কাজেই পরোক্ষভাবে হলেও রাজনৈতিক কর্মসূচি, তার বাস্তবায়ন এবং কর্মসূচি-বিরোধী রাষ্ট্রপক্ষের ভূমিকা ভালোভাবেই পাওয়া গেছে। সেখানে রাষ্ট্রপক্ষকে বস্তুত দমন-পীড়নে সিদ্ধহস্ত এক দানব হিসাবেই পাওয়া যায়। হাফিজ যখন বলে, 'কটাই বা লাশ আর। গোর-খুঁড়েগুলোকে নিয়ে আমি একলাই সব সাফসুফ করে রাখতাম' (পৃ. ৩৯)[১]। তখন আসলে এক ভয়ানক নিপীড়ক কাঠামোর দাঁত ও নখর উন্মোচিত হয়। নেতার প্রত্যক্ষ উক্তিতে আর হাফিজের মনোভঙ্গি ও উচ্চারণে রাষ্ট্রপক্ষের এ 'কর্মসূচি' বারবার সামনে এসেছে।

আন্দোলনকারীদের কর্মসূচি আছে পরোক্ষ বয়ানে– একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনার নানামাত্রিক উপস্থাপনায়। তবে প্রত্যক্ষভাবে প্রধানত নেতার সংলাপে নিপীড়িত মানুষের এক তৎপরতার কথা বারবার উচ্চারিত হয়ে প্রায় প্রতীকী মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। এর নাম 'মিছিল'। গোরস্থানে হাফিজের মুখে গোলমালের কথা শুনে নেতার তৎক্ষণাৎ মিছিলের কথাই মনে হয়। মিছিলই প্রতিবাদ-প্রতিরোধের একমাত্র ভাষা, যা তার কল্পনায় সহসা ধরা দেয়। হাফিজের কাছে তার জিজ্ঞাসা: 'গোলমাল? গোরস্থানের মুর্দারাও মিছিল করতে শিখেছে নাকি?' তাই তার দিক থেকে দমন-পীড়নের মূল লক্ষ্যও হয়ে দাঁড়ায় মিছিল বন্ধ করা। হেলুসিনেশনে বিবেক-চরিত্রের মতো আবির্ভূত মুর্দা ফকিরের জন্য তার একই দাওয়াই: 'পুঁতে ফেল। দশ-পনেরো বিশ-পঁচিশ হাত

– যত নীচে পারো... । যেন মিছিল করতে না পারে, শ্লোগান তুলতে না পারে, যেন চ্যাঁচাতে ভুলে যায়।' (পৃ. ৪৫)

কবর নাটক এভাবে মিছিলকে কর্মসূচির এক কার্যকর প্রতীকে পরিণত করে। পাকিস্তান আমলের পরবর্তী দিনগুলোতে এ মিছিলই হয়ে উঠেছিল রাজনৈতিক তৎপরতার প্রধান চিহ্ন। আহমদ ছফার *ওঙ্কার* (১৯৭৫) বা আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *চিলেকোঠার সেপাই* (১৯৮৬) উপন্যাসে, কিংবা শামসুর রাহমানের কবিতায় উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানকালে মিছিলের অবিস্মরণীয় আয়োজন আমাদের সে কথাই মনে করিয়ে দেয়।

২.২

মোটেই কাকতালীয় নয়, *আরেক ফাল্গুন* উপন্যাসেও মিছিল এক কেন্দ্রীয় চরিত্র। কর্মসূচির নানা বৈচিত্র্যের মধ্যেও মিছিলের বিশেষ শক্তি ও মাদকতা ভুলে থাকার জো নাই। এর বাইরে দেয়ালিকা প্রকাশ, কালো ব্যাজ ধারণ, তিন দিনের 'খালি পায়ে থাকা' কর্মসূচি, রোজা রাখা, কালো পতাকা উত্তোলন, সমাবেশসহ বেশ অনেকগুলো তৎপরতার ছবি পাওয়া যায় এখানে। ১৯৫৫-র একুশে ফেব্রুয়ারির আগের রাতে আন্দোলনকারীরা এক ভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। রাস্তায় মিছিল ও স্লোগানের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞার জবাবে হল, হোস্টেল ও বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে একত্রে স্লোগান দেয়ার কর্মসূচি নেয়। সাফল্যের সাথে পালিত হয় সে কর্মসূচি।

রাজনৈতিক কর্মসূচি ও তৎপরতার দিক থেকে *আরেক ফাল্গুন* উপন্যাসের অন্যতম প্রধান প্রবণতা বায়ান্নর একুশে আন্দোলনের সাথে একটা সমান্তরলতা তৈরির চেষ্টা। পঞ্চান্নের এ আন্দোলনের অনেক নেতা-কর্মী বায়ান্নতেও সক্রিয় ছিল। কাজেই স্মৃতিচারণ বা বর্ণনা করার ছলে তিন বছর আগের বনিয়াদি ঘটনাটিকে জীবন্ত করে তোলা গেছে। যেমন, কবি রসুল বায়ান্নের একুশে ফেব্রুয়ারির বর্ণনা দিচ্ছিল নতুন আসা একদল ছেলেকে। দীর্ঘ বর্ণনা। জহির রায়হানের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ছাপ থাকায় সে বর্ণনার বিশেষ গুরুত্ব আছে। এ বর্ণনায় স্বভাবতই পার্টি-শৃঙ্খলার পরিচয় পাওয়া যায় না, টের পাওয়া যায় আন্দোলনের বিশৃঙ্খল শক্তি ও তেজোদ্দীপ্তি। এখানে গণতান্ত্রিকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা আছে; স্বাক্ষর-সংগ্রহের মতো কর্মসূচির ব্যর্থতার কথা আছে। আছে আরেক দফা মন্ত্রী-এমপিসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সমালোচনা।

সেবার আন্দোলনের কলাকৌশল হিসাবে তারা গ্রেফতার হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। দশজনের ছোটো ছোটো দল গঠন করে গেট অতিক্রম করে গ্রেফতার হওয়াই ছিল সেদিনের পরিকল্পনা। কিন্তু সংখ্যাধিক্যের কারণে যেখানে আন্দোলনকারীদের দাবির ন্যায্যতা সম্পর্কে সরকারের নিশ্চিত হওয়ার কথা ছিল, সেখানে তারা বুলেটের প্রতাপে মিছিল আর আওয়াজ থামিয়ে দেওয়ার কৌশল অবলম্বন করে। আন্দোলনকারীদের গণতান্ত্রিক কর্মসূচির বিপরীতে এভাবে রাষ্ট্রপক্ষের ফ্যাসিবাদী তৎপরতা স্পষ্ট হয়। অন্যভাবে পঞ্চান্নের আন্দোলনেও সমরূপ কর্মসূচি পালিত হয়েছে। প্রবণতার দিক থেকে পঞ্চান্নের আন্দোলনকে বায়ান্নের প্রসারণও বলা সম্ভব।

কালো ব্যাজ পরিধান করা নিষিদ্ধ করেছে বলে মেয়েরা পরেছিল কালো শাড়ি। 'দেখি ওরা আমাদের শাড়ি পরা ব্যান্ড করতে পারে কিনা' (পৃ. ১৮৫)[২]। সহকর্মীদের সাথে আলাপকালে বলেছে এক নারী আন্দোলনকারী। আন্দোলন সবসময়ই তৈরি করতে থাকে নানা চিহ্ন। নিরীহ ঘটনা বা প্রতীক নতুন তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয়ে পেতে থাকে নতুন মাত্রা। একটা গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি ছিল দেয়াল পত্রিকা টানানো। বিদ্যালয়ের

নোটিশ-বোর্ডের পাশে লাল কালিতে লেখা দেয়ালিকাটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাতে রুমের লাইট নিবিয়ে প্রায় গেরিলা কায়দায় নীলা-বেনুরা তৈরি করেছিল এই দেয়াল পত্রিকা। দেয়ালিকার প্রতি– এবং এ ধরনের অন্য কর্মসূচিগুলোর প্রতি– শিক্ষার্থীদের প্রবল আগ্রহ মধ্যবিত্ত পরিসরে আন্দোলনটির জনপ্রিয়তার ইঙ্গিত দেয়।

এ উপন্যাসে রাষ্ট্রপক্ষের তৎপরতাও খানিকটা বিশদ আকার পেয়েছে। একটা পুলিশি রাষ্ট্রে তৎপরতাও নিশ্চয়ই পুলিশি নির্যাতনকে ঘিরেই আবর্তিত হবে। পুলিশ কর্মকর্তা কিউ খানের বাসায় ইন্সপেক্টরদের রাত-দুপুরে ডেকে পাঠানো, আর পুরো শহর তল্লাশি করে আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের গ্রেফতার করার সিদ্ধান্ত বস্তুত তারই প্রকাশ। অবশ্য আন্দোলনকারীর সংখ্যা যথেষ্ট বেশি হওয়ায় ইন্সপেক্টর রশীদের সন্দেহ হয়, ধরাধরি করে সুবিধা করা যাবে কি না। কর্মসূচির দিক থেকে সরকারপক্ষ খুব প্রস্তুত– তার পুলিশ ও মিলিটারি বাহিনীসহ। মুনিম ও অন্যদের বাসায়ও পুলিশ গেছে, যদিও তারা আগেভাগে অন্যত্র সরে থাকায় ধরা পড়েনি।[৩]

৩

তবে রাজনৈতিক কর্মসূচি আর তৎপরতার এ জাহেরি স্তর ছেড়ে আমরা যদি রাজনৈতিকতার তুলনামূলক বাতেনি স্তরে প্রবেশ করি, তাহলে ভাবাদর্শিক অবস্থান ও বিরোধের নানা মাত্রা দেখতে পাব। বস্তুত, ভাবাদর্শিক পর্যালোচনা থেকেই পৌঁছানো যাবে রাষ্ট্রকল্পে– যে রাষ্ট্র সবসময়, অন্তত আলোচ্য দুই টেক্সটে, ভাবিকালের দিক-নির্দেশক।[৪]

৩.১

নেতা যখন বলে, 'গত চার-পাঁচ বছরের মধ্যে ভয় কখনই মনে ঢুকতে পারেনি' (পৃ. ৩৮)। তখন পরিষ্কার বোঝা যায়, সাতচল্লিশোত্তর পর্বে পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামো বস্তুত জনপ্রতিনিধিত্বের বাইরে থেকে জনবিচ্ছিন্ন নির্বাহীদের অগণতান্ত্রিক কর্তৃত্বে পরিচালিত হয়েছে। এ রাষ্ট্রকাঠামোই আরো স্পষ্টভাবে মূর্ত হয়, যখন নেতাকে বলতে শোনা যায়, 'ওরা আমার বিশ্বাসী লোক। আপনার সারা অফিস ঢুড়লেও অমন লোক জুটতো না' (পৃ. ৩৯)। বোঝা যায়, কোনো কাঠামোগত স্থিতি নয়, নিয়মতান্ত্রিক আমলাতন্ত্র বা পুলিশ-প্রশাসন নয়, 'বিশ্বাসী' লোকের 'প্যেট্রন-ক্লায়েন্ট' সম্পর্কের ভিত্তিতেই রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছিল। 'আধুনিক' কথাটার যে অর্থই করা হোক না কেন, তার কোনোটার খোপেই এ ধরনের একটা রাষ্ট্রকাঠামোর সংস্থান হতে পারে না। স্বভাবতই, যে নিয়মতান্ত্রিক অঙ্গ-বিভাজনের উপর আধুনিক রাষ্ট্রকাঠামো প্রতিষ্ঠিত, *কবর* নাটকের বিদ্যমান রাষ্ট্রতন্ত্রে তার ছিটেফোঁটাও ছিল না। একমাত্র এরকম একটা রাষ্ট্র-কাঠামোর মধ্যেই নেতার পক্ষে বলা সম্ভব: 'টাকার জন্য চিন্তা করবেন না। যা দরকার তার চেয়ে বেশী ছড়িয়ে যান। সরকারের অনুমোদন আমি যোগাড় করে দেবো' (পৃ. ৪১)। এ উচ্চারণ কেবল এক নীতি-নৈতিকতাহীন বিশৃঙ্খল রাষ্ট্রতন্ত্রের পরিচয় দেয় না, এমন এক পিছিয়ে-পড়া রাষ্ট্রের কথাও বলে, যে রাষ্ট্র-কাঠামো দলীয় রাজনীতি এবং আইনানুগ নির্বাহীর মধ্যে কোনো ফারাক করতে জানে না।

নেতা চরিত্র প্রণয়নে জিন্নাহর ব্যাপক ছায়াপাত আছে। 'এসব কাজে নার্ভাস হলে এত বড় প্রতিষ্ঠানের নেতা হতে পারতাম না' (পৃ. ৪১)। নেতার এ সংলাপ স্পষ্টতই ক্ষমতাসীন দলের নেতৃস্থানীয় পদের ইশারা দেয়। অন্যত্র কথাটা বলা হয়েছে আরো খোলাখুলি। কবর থেকে উঠে আসা বেয়াড়া তরুণকে বশীভূত করতে গিয়ে

নেতা বলেছে, 'দেখ ছেলে, আমার বয়স হয়েছে। তোমার মুরব্বিরাও আমাকে মানে। বহুকাল থেকে এদেশের রাজনীতি আঙ্গুলে টিপে টিপে গড়েছি, শেপ দিয়েছি। কওমের বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের, বলতে পার, আমিই একচ্ছত্র মালিক! কোটি কোটি লোক আমার হুকুমে ওঠে বসে' (পৃ. ৫২)। পাকিস্তান রাষ্ট্রের তৎকালীন বাস্তবতায় এ কথা– মিমিক্রি এবং ব্যঙ্গের প্রবলতা সত্ত্বেও– একমাত্র জিন্নাহর পক্ষেই বলা সম্ভব। কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনা ঘটার বহু আগেই জিন্নাহ গত হয়েছেন। এমতাবস্থায় এ সংলাপ আদতে পাকিস্তান রাষ্ট্রকেই কেবল চিহ্নিত করতে পারে। ইতিহাসের জিন্নাহ যেমনই হোক, তাঁর ছায়ায় নির্মিত *কবর* নাটকের নেতা এক প্রবঞ্চক চরিত্র বৈকি। আর রাষ্ট্রটিও অন্যায্যতার মূর্ত প্রতীক। এখানে নেতা, রাষ্ট্র আর প্রশাসন যৌথভাবে কাজ করে বেআইনিভাবে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের এ পরিচয় পরবর্তী বাংলাদেশের ইতিহাসে-সাহিত্যে বহুবার নির্মিত হয়েছে। *কবর* সম্ভবত এর সর্বপ্রাচীন নমুনা। এর বিপরীত রাষ্ট্রমূর্তি এ নাটকে উচ্চকিত হয়েছে মুখ্যত মুর্দা ফকির আর শহিদদের উচ্চারণে। নিশ্চিতভাবে তা এক গণতান্ত্রিক, সহনশীল আর কল্যাণকামী রাষ্ট্র।

এই মুর্দা ফকিরের মাধ্যমেই নাট্যকার উপস্থাপন করেছেন এ নাটকের সবচেয়ে কার্যকর ভাবাদর্শিক ডিসকোর্স। 'জীবিত' ও 'মৃত' শব্দ দুটির বিদ্যমান অর্থ বদলে দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন রাজনৈতিকতার এক কাঙ্ক্ষিত সত্য। নেতা ও হাফিজকেই সাব্যস্ত করেছেন মৃত ব্যক্তি বলে, যারা অন্যায়ভাবে বেঁচে থেকে ক্ষমতা-সম্পর্কের উঁচু মোকামগুলোর দখল নিয়ে অনর্থ সৃষ্টি করছে। অন্যদিকে, যে মৃতরা কবরে গেছে তাজা বারুদের গন্ধ বুকে ধারণ করে, মুর্দা ফকির বলছে, তারা কিছুতেই কবরে থাকবে না। যতই গোপনে আর গভীরে চালান করা হোক না কেন, ঠিকই উঠে আসবে মাটি ফুঁড়ে, প্রতিষ্ঠা করবে নতুন দিনের নতুন রাষ্ট্র। অন্যভাবে বললে, যে দাবি জনলগ্ন, আর যার উৎপত্তি মানুষের ন্যায্যতার গভীর থেকে, তার ভাবাদর্শিক জোর আর বিস্তারধর্মী বিশিষ্টতা আসলে অপ্রতিরোধ্য। কাজেই আগামীর রাষ্ট্রতন্ত্রে তার সাফল্যও পরম কাঙ্ক্ষিত। *কবর* নাটকে এভাবে চিত্রিত হয়েছে বিশ শতকের চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের আধুনিক, গণতান্ত্রিক ও বুর্জোয়া চিন্তাচেতনা। মুর্দা ফকির যে বলেছে, যারা মারা গেছে তারাই বরং জীবিত, তা আসলে বর্তমান জরাজীর্ণ রাষ্ট্রের বিপরীতে সম্ভাব্য বুর্জোয়া রাষ্ট্রেরই আকাঙ্ক্ষা।

৩.২

জহির রায়হান মানুষের লড়াই-সংগ্রামকে দেখতে চান স্থান ও কালের বড়ো প্রেক্ষাপটে। বিশেষত, সময়ের দিক থেকে পূর্বতন তৎপরতার সাথে বর্তমানের একটা সংযোগ তাঁর বহু রচনায় দেখা যায়। এর ফলে নিপীড়ন ও প্রতিরোধ– উভয়ই এক ভিন্ন মাত্রায় উদ্ভাসিত হয়। *আরেক ফাল্গুন*ও এর ব্যতিক্রম নয়। উপন্যাসটি শুরু হয়েছে ভিক্টোরিয়া পার্ক এলাকা থেকে। এ সূত্রে লেখক এ পার্কের সাথে যুক্ত ব্রিটিশ-নিপীড়ন আর প্রতিরোধ-সেনাদের ইতিবৃত্ত টেনেছেন। ইতিহাসের তথ্য-উপাত্তে না গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন প্রধানত লোকমুখে প্রচলিত কাহিনির। তাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের 'পাপে'র ব্যাপারে লোকমনে জাগরূক নিশ্চয়তার বিবরণ আছে। প্রাকৃতিক ন্যায়ের কথাও উচ্চারিত হয়েছে জনমানুষের বরাতে। উপন্যাসটিতে ন্যায্যতার পক্ষে লড়াইরত মানুষদের উপর রাষ্ট্রপক্ষের যে অন্যায় জুলুম, ভিক্টোরিয়া পার্ককে উপলক্ষ্য করে রচিত কথামালা নিঃসন্দেহে তার এক পূর্ব-দৃষ্টান্ত হাজির করে এবং এভাবে বর্তমান নিপীড়নকেই চিহ্নিত করে।

এ নিপীড়নে রাষ্ট্রপক্ষ যতটা স্পষ্ট তারচেয়ে অনেক বেশি প্রকট 'ওরা'। নিঃসন্দেহে উপন্যাসটির রচনাকালে যে জাতীয়তাবাদী বিভাজন ও প্রত্যয় খুব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, উনিশশো পঞ্চান্ন সালের ভাষ্য প্রস্তুত করতে

গিয়ে তারই প্রবল ছায়াপাত ঘটেছে। ফলে 'দেশ' ও 'দেশের মানুষ' এখানকার রাজনৈতিকতায় খুব গুরুতর হয়ে উঠেছে, যার অনিবার্য পরিণতি জাতীয়তাবাদী অভীপ্সা ও রাষ্ট্রকল্প। মূল কর্মসূচির আগের রাতে ছাদে স্লোগান চলার কালে শাহেদ সালমাকে মনে করিয়ে দেয়, আগের নির্বাচনের সময়ও এ ধরনের কর্মসূচি পালিত হয়েছিল। কিন্তু যারা নির্বাচিত হয়ে গেছে, তারা এখন আন্দোলনকারীদের কোনো সাহায্য করছে না। প্রতিবেশী রাজ্জাক সাহেব যেন সালমার পক্ষ থেকে উত্তর দেয়, ভালো মানুষ নিশ্চয়ই আছে, তাদের খুঁজে বের করাই আসল কাজ। সে আশাতেই হয়তো এখন সবাই ছাদে স্লোগান দিচ্ছে– 'সবাই যেন এককণ্ঠে আশ্বাস দিচ্ছে, দেশ আমার, ভয় নাই' (পৃ. ১৯১)।

উপন্যাসটিতে এ আকাঙ্ক্ষা এবং বাস্তবতার পরিচয় বারবার এসেছে। আন্দোলনকারী নেতা-কর্মীদের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের একচ্ছত্র প্রাধান্য সত্ত্বেও বলার চেষ্টা আছে যে, ব্যাংকের কেরানি, সরকারি অফিসার কিংবা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছাত্র-আন্দোলনের প্রতি এক সর্বৈব সমর্থন আছে। কিছু একটা হবে, সে আকাঙ্ক্ষা আছে। অন্যদিকে, বায়ান্নর আন্দোলন যে এই তিন বছরে অনেক বেশি অংশগ্রহণমূলক হয়েছে, বিপুল সংখ্যক মেয়ে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছে এবার, অহেতু নিপীড়নের শিকার হয়ে আন্দোলনের অংশ হয়ে উঠছে রশীদ চৌধুরীর মতো অরাজনৈতিক ছাত্রও, আর 'আসছে ফাল্গুনে' দ্বিগুণ হওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করছে আন্দোলনকারীরা– সে প্রসারণ নিঃসন্দেহে জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষারই সাফল্য।

কবর নাটকে অতটা নয় কিন্তু *আরেক ফাল্গুন* উপন্যাসে জাতীয়তাবাদী বিভাজন ও অপরায়ণটা বেশ স্পষ্ট হয়ে গেছে। 'ওদের' অন্যায় ও জুলুমই বিভাজনের উৎস। স্বাভাবিক মানবিক জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও সে আকাঙ্ক্ষায় রাষ্ট্রপক্ষের অন্যায় বাধার কথা বারবার বলা হয়েছে। একেবারে শেষ দৃশ্যে রাষ্ট্রপক্ষকে পরোক্ষে 'বিদেশি' আখ্যা দেয়ার মধ্য দিয়ে ঘটেছে তার চূড়ান্ত প্রকাশ। এখানে আবার সেই মাঠের উল্লেখ করা হয়েছে। একশ বছর আগের কাহিনির সাথে মিলিয়ে লেখক যে ভাষায় বর্তমান ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে তাঁর মনোভঙ্গি মোটেই গোপন থাকেনি: 'যেখানে এককালে সেই একশো বছর আগে দেশী সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছিল বিদেশি বেনিয়াদের বিরুদ্ধে' (পৃ. ২১০)।

তবে জাতীয়তাবাদী 'অপরায়ণ' যেন একমাত্রিক 'আমরা'র অন্ধ গলিতে বিপথগামী না হয়, সে ব্যাপারে লেখক সতর্ক ছিলেন বলেই মনে হয়। সীমান্তের ছেলে ওসমান খানকে প্রতিবাদী ছাত্রদের তালিকায় যোগ করে লেখক জাতীয়তাবাদী সংকীর্ণতার দিকেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 'ছাত্রদের বেপরোয়া মারতে দেখে সে আর স্থির থাকতে পারলো না। বারান্দা থেকে লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো পুলিশের মাঝখানে। ইয়ে সব ক্যায় হোতা হ্যায়, হামলোগ ইনসান নাহি হ্যায়'– বলে পুলিশকে জড়িয়ে ধরে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে ওসমান খান (পৃ. ২০১)।

ওসমান খানের উর্দুসমেত এ আন্দোলনে যোগদান এভাবে এক ভিন্ন বাস্তবতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভাষা ও জাতীয়তার প্রশ্নটিকে জটিলতাসহ ভাবতে উদ্‌বুদ্ধ করে। ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্তও অবশ্য এ দৃষ্টিভঙ্গির অনুকূল। ঢাকার সর্দাররা এ আন্দোলনে সমর্থন জানিয়েছিল, আর এ আন্দোলন ঢাকার উর্দুভাষী জনগণের সমর্থনও লাভ করেছে। তাছাড়া, পুরো আন্দোলনে বরাবরই এ দাবিই উচ্চারিত হয়েছে যে, একমাত্র বাংলা নয় বরং উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হোক।[৫] *আরেক ফাল্গুন* তার জাতীয়তাবাদী জোশের মধ্যেও সে বাস্তবতার স্থান-সংকুলান করেছে।

৪

উপরে রাজনৈতিকতা ও রাষ্ট্রকল্পের যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তার বাইরেও এমন অনেক প্রসঙ্গ আছে, যেগুলো সামগ্রিক অবস্থানের নিগূঢ় পরিচয়ের জন্য খুব জরুরি। অন্যভাবে বলা যায়, মানুষের ব্যষ্টিক-সামষ্টিক যাপিত জীবনের পটভূমিতে যখন এ ধরনের বিষয়গুলো পরীক্ষিত হয়, তখন রচয়িতার উদ্দিষ্ট 'সত্য'র বাইরেও এমন অনেক 'সত্য' জমে ওঠে, যেগুলো মূল উদ্দিষ্টে ভিন্নকৌণিক আলো ফেলতে পারে। বলা যায়, ওসব এলাকায় রচয়িতার সচেতন সত্তার পাশাপাশি অচেতনও সক্রিয় থাকে। পাঠ-ক্রিয়ায় সচেতন অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে তার কার্যকর স্বরূপ উন্মোচন করা সম্ভব।

যেমন, প্রশ্ন তোলা যায়, ভাবাদর্শিক উপাদান হিসাবে 'ধর্ম' এ দু'টো টেক্সটে কী ধরনের গুরুত্ব পেয়েছে। পাকিস্তান আমলের রাজনৈতিকতা ও রাষ্ট্রকল্প পর্যালোচনায় এ প্রশ্নের গুরুত্ব এই যে, ইসলাম রাষ্ট্রটির ঘোষিত ভাবাদর্শ হিসাবে বিশেষভাবে ব্যবহৃত এবং অপব্যবহৃত হয়েছে। পূর্ব-পাকিস্তান তথা পূর্ব-বাংলা মুসলমান-প্রধান এলাকা হওয়ায় এবং সাতচল্লিশ-পূর্ব রাজনীতিতে 'ধর্ম' বর্গের অধীনে এ অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করায়, এখন নতুন জাতীয়তাবাদী বয়ানে ওই বর্গের অবস্থান বিশেষভাবে কৌতূহল-উদ্দীপক হয়ে ওঠে।

দুটি টেক্সটের ক্ষেত্রেই মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর উপর 'মাত্রাতিরিক্ত' নির্ভরতাও এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হিসাবে হাজির হতে পারে। তৎকালীন বাংলাদেশের জনমিতির বিবেচনায় শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠী দেশের সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব কীভাবে, কতটা করে, সে প্রশ্ন মোটেই অমূলক নয়।

কবর ও *আরেক ফাল্গুন*-এর ক্ষেত্রে আরেকটি প্রশ্নও খুব প্রাসঙ্গিক। গ্রন্থ-দুটির লেখক যথাক্রমে মুনীর চৌধুরী এবং জহির রায়হান বলেই। মুনীর চৌধুরী বামপন্থি রাজনীতি খুব বেশিদিন করেননি; তবে যখন করেছেন, 'ভীষণভাবে করেছেন'। এ রাজনীতির জন্যই তিনি ১৯৪৮ সালে কারাবাস করেন (রফিকুল, ১৯৭২ পৃ. ১১-১২)। অন্যদিকে, জহির রায়হানের উক্ত রাজনৈতিক অবস্থান শেষ পর্যন্ত কম-বেশি অক্ষুণ্ন ছিল। দুটি টেক্সটেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন দাঁড়ায়, এখানে বামপন্থা ও জাতীয়তাবাদ ঠিক কীভাবে কাজ করেছে এবং এ দু'য়ের আপসরফা কীভাবে হয়েছে? সার্বিক মতাদর্শিক বিবেচনায় এ দু'য়ের বড়ো ধরনের বিরোধ আছে। আর সে কারণেই ঢাকার বিশেষ বাস্তবতায় এ দুই টেক্সটে এ দু'য়ের সহাবস্থান কীভাবে, কতটা ঘটেছে, সে পর্যালোচনার বিশেষ তাৎপর্য আছে।

৪.১

দুটি টেক্সটের জন্যই রাজনৈতিকতার খুব স্পর্শকাতর এলাকা ছিল ধর্ম। পাকিস্তান রাষ্ট্রটি ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়– স্পর্শকাতরতার এটাই একমাত্র কারণ নয়। বরং সত্য এই যে, ক্রমশ রাষ্ট্রটি তার প্রায় একমাত্র 'ইডিয়লজিকেল স্টেট অ্যাপারেটাস' হিসাবে ধর্মকে প্রতিষ্ঠা দিচ্ছিল। এমতাবস্থায় ছদ্ম-আদর্শিকতার এ বর্গটিকে সমস্যায়িত না করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের কোনো মর্মগত সমালোচনা দাঁড় করানো আসলে অসম্ভব। অপরদিকে, জনজীবনের ধার্মিকতা এবং ধর্মের 'প্রকৃত' আদর্শিক বয়ান এর ফলে যেন ক্ষুণ্ন না হয়, সেদিকেও কড়া নজর রাখতে হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে দুই টেক্সটের মোকাবেলার ধরন একরকম নয়।

কবর নাটকের সংলাপে প্রযুক্ত হাস্যরস ও ব্যঙ্গ রাষ্ট্র-ক্ষমতার কুশীলবদের ভালোভাবেই স্পর্শ করেছে। মদ্যপানের কথাই ধরা যাক। স্পষ্টতই, মদ্যপান নাটকটির অন্যতম প্রধান কলা ও কৌশল। এ অর্থে যে,

কেবল অবিশ্বাস্য পরিমাণে মদপান করিয়েই দু'জনের সামষ্টিক হেলুসিনেশন সম্ভবপর হয়েছে। কিন্তু উপরি হিসাবে ক্রমাগত মদপান অন্য নানা মাত্রাও তৈরি করে। যে রাষ্ট্রের নেতারা ইসলামকে মতাদর্শিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার বা অপব্যবহার করে রাষ্ট্রশাসন করে, তাদের মদ্যপ-দশা নিঃসন্দেহে মঞ্চে এক কমিক আবহ তৈরি করে। পুলিশ-প্রশাসক হিসাবে হাফিজও এর বাইরে থাকে না।

তবে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের ঘোষিত রাষ্ট্রাদর্শটি যে আদতে কপটাচার, সে সত্য তুলে আনতে নাট্যকার মোটেই ইতস্তত করেননি। কাজটা তিনি প্রথমে করেছেন 'অশিক্ষিত' কিন্তু স্বাভাবিক ধর্মজ্ঞানে স্নাত গোরখোদকদের দিয়ে। তারা প্রশ্ন তুলেছে মৃতের ধর্মীয় কৃত্যের অধিকার নিয়ে। স্পষ্টতই রাষ্ট্রতন্ত্র সে অধিকার দিতে সম্মত ছিল না। তদুপরি এমন কোনো লক্ষণও প্রকাশিত হয়নি, যাতে মনে হতে পারে, ব্যাপারটাকে তারা গুরুতর মনে করে। তবে পরিস্থিতির কারণে সেদিকে অগ্রসর হতে পারছে না। 'একটা বড়-মতোন গর্ত করে সবগুলো তার মধ্যে ঠেসেঠুসে পুরে মাটি চাপা দিয়ে দিলেই হয়' (পৃ. ৪১) –ইন্সপেক্টর হাফিজের এ প্রস্তাব আর নেতার সোৎসাহ সমর্থন তাদের সে ধর্মনীতিহীন অবস্থানকেই সামনে নিয়ে আসে। উল্লেখ্য, মৃতের সৎকার মুনীর চৌধুরীর *রক্তাক্ত প্রান্তর* নাটকেরও অন্যতম নির্ণায়ক বর্গ। তবে ওই নাটকে যেমন, তেমনি *কবর* নাটকেও বর্গটি ধর্মীয় পোশাক ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছে নিখিল মানবাধিকারের বর্গে। এভাবে ধর্মীয় বর্গের, বলা যায়, সেক্যুলারায়ন ঘটেছে, আর মানবিকতার নিক্তিতেই পাকিস্তানি রাষ্ট্রপক্ষের সমালোচনা সম্ভবপর হয়েছে।

এর পরেই সামনে আসে মুর্দা ফকির। চরিত্রটি নিঃসন্দেহে লেখকের কাঙ্ক্ষিত অবস্থানের প্রতিনিধি এবং বিবেক ধরনের চরিত্র। তার পরিচয় দিতে হাফিজ বলেছে: 'লোকটা এমনিতে ভালো লেখা-পড়া জানে। ভালো আলেম...' (পৃ. ৪৩)। মুর্দা ফকিরের পরিচয়ে 'আলেম' শব্দটির প্রয়োগ একেবারেই জরুরি ছিল না। স্পষ্টতই আদর্শিক বুলি হিসাবে রাষ্ট্রপক্ষের ধর্ম-ব্যবহারের বিপরীতে এই 'আলেম' শব্দটি আরেকটি বর্গ খাড়া করে, যেখানে ধর্মের স্বাভাবিক আদর্শিকতা রক্ষিত হয়েছে এবং যা মানবিক অবস্থানের রক্ষক। এভাবে তা পরোক্ষে গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া রাজনীতির সঙ্গেও সঙ্গতি রক্ষা করে।

আরেক ফাল্গুন উপন্যাসে ধর্মীয় অনুষঙ্গ আন্দোলনের কর্মসূচি হিসাবেই উপস্থিত হয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারির পরে অন্যতম কর্মসূচি হিসাবে গায়েবি জানাজা পড়া হয়। আর উপস্থিত জনতার মুখে পাকিস্তান রাষ্ট্রের নিপীড়নের জন্য খোদার কাছে আহাজারি শোনা যায়: 'গায়েবি জানাজা পড়ার জন্য সমবেত হয়েছিল ওরা। আর বুড়ো ইমাম সাহেব মোনাজাত করতে গিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠে বললেন, যারা আমাদের কচি ছেলেদের গুলি করে মারলো, খোদা তুমি তাদের ক্ষমা করো না' (পৃ. ১৭৭)।

আন্দোলনের আরেকটি কর্মসূচি রোজা রাখা। কর্মসূচি হিসাবে এর কৌশলগত সুবিধা খুবই চমৎকার। একদিকে ধর্ম যেহেতু পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রধান ভাবাদর্শ, তাই ধর্মীয় অনুষঙ্গ আন্দোলনকারীদের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা তৈরির ক্ষেত্রে খুবই কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। আবার সামষ্টিক কর্মসূচি হিসাবেও তা খুব অংশগ্রহণমূলক এবং আন্তরিক। লক্ষণীয়, এ কর্মসূচি আন্দোলনকারীরা খুব আন্তরিকভাবেই পালন করেছে। সেহরি না খেয়েও রোজা রেখেছে অনেকে, কিন্তু রোজা রাখার কপটতা করেনি। মালতি বলেছে, এখানে যারা রোজা রেখেছে তারা না খেয়েই রেখেছে। 'রোজা রেখেছিল শুনলে অমনি চাকরি নট হয়ে যাবে' (পৃ. ১৮৪)। রোজা রাখায় চাকরি যাবে– এ ভাষা নিশ্চয়ই রাষ্ট্র-কাঠামোর উপর বড়ো ধরনের চাপ তৈরি করে।

তবে, দুই টেক্সটের কোনোটিতেই দৈনন্দিন চর্চার অংশ হিসাবে বা জনজীবনে ধর্মপালনের ব্যাপারটি প্রাধান্য পায়নি। এমনকি রাষ্ট্রপক্ষীয় 'ভিলেন'দের মধ্যেও এ বস্তু দেখা যায়নি। নবাগত যে নতুন স্পর্শকাতরতা,

মূল্যবোধ এবং জীবনবীক্ষা *কবর* ও *আরেক ফাল্গুন*'-এর কাঙ্ক্ষিত জনগোষ্ঠীর মূল স্বভাব, তার সাথে এ অনুপস্থিতির যোগ থাকা অসম্ভব নয়। আমরা এখন সে জনগোষ্ঠীর খবর নেব।

৪.২

কবর নাটকের সংলাপে মূর্ত ভাষিক তাৎপর্যের এক মাত্রা এই যে, 'প্রমিত' বাংলা এখানে আধুনিক ও প্রগতিপন্থি তরুণদের ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নেতা ও হাফিজের ফারসি-আরবি ও সামন্তগন্ধী ভাষার বিপরীতে মুর্দা ফকির ও শহিদ তরুণদের শব্দ আর ভাষারূপ প্রণয়নে ব্যতিক্রমহীনভাবে 'প্রমিত' বাংলার প্রশ্রয় এ তাৎপর্যকে দ্বিধাহীনভাবে প্রতিষ্ঠা দেয়। হাফিজের দুটি সংলাপ উদ্ধৃত করে শব্দ-ব্যবহার ও ভাষারূপের ভাবাদর্শিক প্রকাশ দেখানো যাক।

বিশ্বাসী লোকের অভাব প্রসঙ্গে নেতার আফসোসের জবাবে হাফিজ বলে: 'সব একেবারে হারামীর বাচ্চা। বেতনটাকে পাওনা দাবী হিসেবে আদায় করতে চায়, নিমক বলে মানে না' (পৃ. ৩৯)। আবার রাতের এ গোপন মিশনে গার্ডের মতো উটকো লোক নিয়ে আসা ঠিক হয়নি– এ মতের পক্ষে যুক্তি হিসাবে সে বলে: 'তবু কিছু কাজ আছে স্যার, যা বিবির সামনেও বেপর্দা করতে নেই' (পৃ. ৩৯)। দুটি সংলাপেই শব্দরূপের বাহ্য অবয়ব খুব স্পষ্ট। কিন্তু গভীর-স্তরে প্রযুক্ত শব্দের সাথে সম্পর্কিত ডিসকোর্স উপস্থিত হয় রাজনৈতিকতা ও রাষ্ট্রকল্পের একেবারে অন্দরমহলের খবরসহ। প্রথম সংলাপের 'নিমক' কথাটাই ধরা যাক। শব্দটি আন্তঃব্যক্তি-সম্পর্কের যে ধরন সাব্যস্ত করে, তা নিঃসন্দেহে আধুনিক-পূর্ব, আর রাষ্ট্রের সাথে নাগরিকের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হওয়ায় এবং একজন পুলিশ অফিসারের মুখে ব্যবহৃত হওয়ায় তা খোদ রাষ্ট্রেরই চিহ্নায়ক হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় সংলাপের 'বিবি' ও 'বেপর্দা' কথা দুটি সাংস্কৃতিক বার্তায় খুবই ভারাক্রান্ত– অনাধুনিক যদি নাও হয়, মোটেই সর্বজনীন নয়। কিন্তু সংলাপের ভিতর-কাঠামোয় ধৃত সংবাদটি আরো মর্মান্তিক। রাষ্ট্রীয় কাজে বিশেষ গোপনীয়তা রক্ষা করতে হয়– এ সংজ্ঞাপন এর লক্ষ্য নয়; লক্ষ্য আসলে এক অবৈধ কর্মযজ্ঞের ব্যাপারে নিজেদেরই স্বীকৃতি। লক্ষণীয়, মৃত তরুণ ও মুর্দা ফকিরের সংলাপে এ ধরনের শব্দ নেই; আর যদি অনুরূপ শব্দ থাকেও, তা কিছুতেই সমরূপ তাৎপর্যে ব্যবহৃত হয়নি।

হুমায়ুন আজাদ লক্ষ করেছেন (২০১২, পৃ. ২৭৮-৭৯), একুশের অন্যতম প্রধান তাৎপর্য এই যে, এটি বাংলাদেশের বাংলা ভাষাকে পরিস্রুত করেছে। এ বিবৃতি 'ভাষারূপের স্বৈরতন্ত্রের সম্ভাবনা'র দিক থেকে যতই সমস্যাপূর্ণ হোক না কেন, *কবর* নাটকের পূর্বোক্ত ভাষা-চৈতন্য আজাদের কথাকে সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করে।

কিন্তু সেক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হয় অন্য জায়গায়। নাটকে নিম্নবর্গের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত গার্ডের সংলাপে ব্যবহৃত কথ্য-আঞ্চলিক বাংলা এক গভীর অপরায়ণের সুযোগ তৈরি করে দেয়। শুধু বাস্তবতা রক্ষার তাগিদ দিয়ে এ ধরনের ভাষা-নির্বাচনকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। কারণ, নাগরিক পরিসরে কাজ করা একজন গার্ডের জন্য সরল নাগরিক কথ্য বাংলা বাছাই করা– অন্তত কেতাবি শব্দ ও ভঙ্গি বাদ দিয়ে, মোটেই অস্বাভাবিক হতো না। কোনো সন্দেহ নাই, গার্ডের সংলাপের জন্য ব্যবহৃত এ ভাষারূপ গৃহীত হয়েছে একদিকে সংলাপে বৈচিত্র্য তৈরির অনুরোধে, অন্যদিকে হাস্যরস সৃষ্টির অভিপ্রায়ে। নাটকটির রসগত বৈচিত্র্যের জন্য এবং 'কমিক রিলিফ'র জন্য এ নির্বাচন যথেষ্ট কার্যকর হয়েছে। কিন্তু 'প্রমিত' বাংলা প্রকল্পিত রাষ্ট্রের প্রতীকী বৈশিষ্ট্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় নিম্নবর্গের মানুষদের জন্য ওই রাষ্ট্রে 'অপরায়ণে'র একটা বড়ো সুযোগ তৈরি হয়ে যায়।

বস্তুত, বায়ান্নকেন্দ্রিক রাষ্ট্রপ্রকল্পের যেসব মূর্তি আমরা জাতীয়তাবাদী বয়ানে বা সৃষ্টিশীল চর্চায় প্রতিষ্ঠিত দেখি, তার প্রায় সবটাতেই এ সংকট বিদ্যমান। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী হিসাবে কোথাও কোথাও শ্রমিকশ্রেণির উপস্থিতি আছে সত্য কিন্তু নাগরিক শিক্ষিত মধ্যবিত্তের স্বরের প্রতাপে সেখানে শ্রমিক বা নিম্নবর্গের অন্য কারো স্বর উচ্চকিত হওয়া দূরের কথা, সমান্তরাল স্বর হিসাবেও শ্রুত হয়নি। আদতে 'একুশের ও তার পরের সমস্ত আন্দোলনে তারাও যোগ দিয়েছে, যাদের বলা হয় 'সাধারণ মানুষ'। কিন্তু ওই সাধারণ মানুষের স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা, স্বার্থ কখনোই বড়ো হয়ে ওঠেনি। তাই একুশ আমাদের দিয়েছে একগুচ্ছ মধ্যবিত্ত চেতনা' (আজাদ, ২০১২, পৃ. ২৭২)। *কবর* নাটকের মতো এ সংকট *আরেক ফাল্গুন* উপন্যাসের রাষ্ট্রকল্পেও সুস্পষ্টভাবে উপস্থিত।

আরেক ফাল্গুন উপন্যাসের জগৎ বিশুদ্ধত নাগরিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্তের জগৎ। রাজনৈতিক তৎপরতার বিচারে ব্যাপারটা আরো সংকীর্ণ হয়ে কেবল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যেই সীমিত থেকেছে। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কবি রসুল ও মুনিম বায়ান্নের আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত সর্বশ্রেণির মানুষদের কথা বলেছে বটে, তবে তাতে ছাত্রদের কেন্দ্রিকতা মোটেই ক্ষুণ্ন হয়নি। আবার, তিন বছর পরের অর্থাৎ পঞ্চান্ন সালের আন্দোলনে পূর্বতন অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত হতে দেখা যায় না। দু-একবার কর্মজীবী মানুষদের সমর্থনের ও আকাঙ্ক্ষার কথা উচ্চারণ করা হলেও তৎপর মানুষদের মধ্যে তাদের কাউকে দেখা যায়নি। তারচেয়ে বড়ো কথা, আন্দোলনের কর্মসূচি ও কাঠামোর মধ্যে অন্যদের অংশগ্রহণের কোনো সুযোগও ছিল না।

উপন্যাসের শুরু থেকে একেবারে শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক কর্মসূচির সাথে সাধারণ জনগণের প্রকট বিচ্ছিন্নতার পরিচয় পাওয়া যায়। শুরুর দৃশ্যেই দেখা যায়, মুনিম ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। ধোপদুরস্ত জামা-কাপড়ের সাথে তার খালি পা এক প্রচণ্ড বিসদৃশ দৃশ্য তৈরি করে। লেখক এ বাবদ কিছু সময় ব্যয় করেছেন, প্রধানত চারপাশের মানুষজন এ দৃশ্যে কীভাবে সাড়া দিচ্ছিল তার বর্ণনা করতে গিয়ে। লোকেরা অনেকগুলো অনুমান করেছে। যা তাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে ছিল, তার সবই সেখানে এসেছে। কিন্তু একটা রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসাবে জুতা না-পরার তথ্যটা তারা কেউই জানত না। ঘটনাটা ঘটেছে তখনকার ঢাকার একেবারে প্রাণকেন্দ্রে– ভিক্টোরিয়া পার্ক থেকে নবাবপুর রোড পর্যন্ত জায়গায়। গুলিস্তান পৌঁছাতে পৌঁছাতে তাদের সংখ্যা দশে উন্নীত হয়। এ দীর্ঘ গমনপথে মুনিমদের খালি পায়ে থাকার কারণটা একটা লোকেরও জানা ছিল না– এ তথ্য জনবিচ্ছিন্নতার দিক থেকে খুব নির্মম এক সত্য প্রকাশ করে। গুলিস্তান এলাকায় একত্র হওয়ার পরে তাদের কেউ কেউ যে বলছিল, একা হাঁটার সময় তাদের ভয় লাগছিল, সে ভয় নিশ্চয়ই কেবল পুলিশের নয়, চারপাশের সাথে সম্পর্কহীনতারও। সমকালীন রাজনীতির চিত্র হিসাবে এটা আংশিকতার লক্ষণাক্রান্ত হতেও পারে কিন্তু লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যবিত্তকেন্দ্রিকতায় কোনো ভুল হওয়ার সুযোগ নাই।

আরেক ফাল্গুন'-এর রাজনৈতিকতায় 'বাবা-সন্তান' অর্থাৎ প্রজন্ম-ব্যবধান একটা খুব গুরুতর ব্যাপার। নতুন প্রজন্ম নতুন দিনের চাহিদা ও রুচির পক্ষে শক্ত অবস্থান নিতে পারে, যা পুরনো প্রজন্ম পারে না বা পারার কথা নয়– এ ধরনের এক পুনরাবৃত্ত দাবি দেখা যায় এ উপন্যাসের বয়ানে। পিতৃহীন সালমার চাচা এর এক প্রমাণ। আসাদও ব্যতিক্রম নয়। আসাদের 'ঘরে মা নেই, বাবা আছেন' (পৃ. ১৮৪)। 'রাজনীতি করা' নিয়ে আসাদের সাথে বাবার গোলমাল। বাবা এমনকি তাকে সাজা দেওয়ার জন্য খরচপত্রও বন্ধ করে দেয়।

সালমার চাচার দৃষ্টিভঙ্গি খুবই স্পষ্ট। যে সময়টা নিজের ক্যারিয়ার গড়ার বয়স, তখন দেশের বা দশের নামে জেলে পচে মরলে পরে কে তাদের দেখবে? কিন্তু আসাদের ক্ষেত্রে 'রাজনীতি করা'টা ঠিক অত সরল মামলা নয়। বামপন্থি বা সরকার-বিরোধী রাজনীতির কোনো ইশারা কি এখানে আছে? তৎকালীন বাস্তবতার সাপেক্ষে তা অসম্ভব নয়। কিন্তু যে কথাটা জোর দিয়ে বলা যায় তা দৃষ্টিভঙ্গি সংক্রান্ত। বলা হয়েছে, এ তরুণরা কাজ করছে দেশের জন্য। তাহলে তাদের বাবারা কি দেশের জন্য কাজ করতেন না, বা দেশের জন্য কাজ করার গুরুত্ব বুঝতেন না? স্পষ্টতই এ এক নতুন দেশ, যার মর্মার্থ কেবল নতুন প্রজন্মই বুঝতে পারবে। তদুপরি, এর সাথে শিক্ষার অনিবার্য যোগ। নিঃসন্দেহে, জহির রায়হানের বাম প্রকল্পই বলি, আর জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষা– সর্বত্র 'ছাত্র-ছাত্রী'দের প্রবল প্রতাপের অন্যতম কারণ এই 'আধুনিক' শিক্ষাজনিত নতুন ধ্যান-ধারণা।

যদি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে একুশে ফেব্রুয়ারিকে দেখা হতো, তাহলে এসব প্রশ্ন এত গুরুতর হয়ে উঠত না। কিন্তু তা তো নয়। দুটি পুস্তকেই সঙ্গতভাবেই ফেব্রুয়ারির ভাষা-আন্দোলনকে বৃহত্তর পটভূমিতে দূরসঞ্চারী ঘটনা হিসাবেই চিহ্নিত-চিত্রিত করা হয়েছে। *কবর* নাটকের চিহ্নায়নে জাতীয়তাবাদ প্রকট না হলেও সামষ্টিক অভীপ্সা এবং নতুন দিনের নতুন রাজনীতির প্রস্তাবনা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে হাজির। আর *আরেক ফাল্গুন*'-এর রাজনীতি তো ঘোষিতভাবেই জাতীয়তাবাদী। কাজেই শ্রেণি ও গোষ্ঠীগত সংকীর্ণতার যে-কোনো আলামত এখানে রাজনৈতিক তাৎপর্য বহন করে।

৪.৩

কবর নাটকে ক্ষমতা-সম্পর্কের একটি বাস্তবতা বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো। রাষ্ট্রতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে প্রবল সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে মুখ্যত ছাত্ররা, তাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহায়ক হিসাবে মুরব্বি গোছের মানুষজন থাকার কথা। ক্ষমতা-সম্পর্কের বিচারে সমাজের তুলনামূলক ভালো অবস্থানে আছে, এমন মানুষদের একাংশের সমর্থন থাকার কথা। কিন্তু এ নাটকের কোথাও তার ইশারা নাই। সে কারণে পুরো ঘটনার দুই পক্ষ এবং তার মূল্যায়নে এক শয়তান-ফেরেশতা ধরনের বাইনারি তৈরি হয়েছে। এ ধরনের বিভাজন এত নিশ্চয়তার সাথে করা যায় যখন একটি রাষ্ট্রকাঠামোকে তার মতাদর্শিক ভিত্তিসহ নাকচ করা হয়। বুর্জোয়া বা লিবারেল বা গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে এটা সম্ভব নয়। যদিও *কবর* নাটকের প্রকল্পিত রাষ্ট্রাদর্শ নিশ্চিতভাবেই 'উদারনৈতিক-গণতান্ত্রিক',[৬] কিন্তু রাজনৈতিক তৎপরতার রূপরেখা থেকে মনে হয়, মুনীর চৌধুরীর বামপন্থি ঝোঁক ওই রূপরেখা প্রণয়নে চেতনে বা অচেতনে বড়ো ধরনের ভূমিকা পালন করেছে।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং তথ্য-উপাত্তও এ অনুমানের সহায়ক। পাকিস্তান রাষ্ট্রে কম্যুনিস্ট আন্দোলন কেবল নিষিদ্ধই ছিল না, রাষ্ট্রের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শত্রুদের অন্যতম হিসাবেও গণ্য হয়েছে। বামপন্থি নেতা-কর্মীরা তাই রাষ্ট্রতন্ত্রকে প্রতিপক্ষ ধরে করা যেকোনো আন্দোলনে ব্যাপকভাবে অংশ নিয়েছিল– সে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনই হোক, আর অসন্তোষজনিত গোষ্ঠীকেন্দ্রিক আন্দোলন হোক। বায়ান্নর আন্দোলনে বামপন্থিদের ব্যাপক অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বদান ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবেই সর্বজনস্বীকৃতি পেয়েছে। সরকার নিজেই একে 'কমিউনিস্ট ও ভারতীয় এজেন্ট'দের কাজ বলে প্রচার করে (বিশ্বাস, ১৯৮৮, পৃ. ২৯২)। মুনীর চৌধুরী নিজেও এ 'অপরায়ণে'র শিকার হয়েছেন। তাঁর 'দুষ্ট ছেলে', 'ফিট কলাম' ইত্যাদি রচনায় রাষ্ট্রবিরোধী 'দুষ্ট' হিসাবে 'বামপন্থি' তরুণের রাষ্ট্র কর্তৃক এবং সমাজের মুরব্বিদের দ্বারা নিপীড়িত হওয়ার বাস্তবতা ফুটে উঠেছে। *কবর* নাটকে চিত্রিত একুশে ফেব্রুয়ারির এক আন্দোলনকারীর পরিচয় দিতে গিয়ে

নেতা পরিষ্কারভাবে সে উল্লেখ করে: 'জীবিত থাকতে তুমি দেশের আইন মানতে চাওনি। মরে গিয়ে তুমি এখন পরপারের কানুনকেও অবজ্ঞা করতে চাও। কম্যুনিজমের প্রেতাত্মা তোমাকে ভর করেছে, তাই মরে গিয়েও এখন তুমি কবরে যেতে চাও না' (পৃ. ৫২)।

আরেক ফাল্গুন উপন্যাসে এ ধরনের অনুমানের পরিসর আরো ব্যাপক। এখানকার আন্দোলনকারী প্রধান চরিত্রগুলো যে বামপন্থি গোপন রাজনীতির সাথে যুক্ত, তার বিস্তর পরোক্ষ ও আধা-প্রত্যক্ষ ইশারা আছে। মুনিমের রাজনৈতিক আদর্শের উল্লেখ না করেই বজলে তার সম্পর্কে বলেছে, ওর আদর্শকে সে 'ঘৃণা' করে। বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক আদর্শ বজলে অপছন্দ করতে পারে কিন্তু ঘৃণা করার কথা নয়। সালমার স্বামী, ভাই ও বোন সবাই তখন জেলবন্দি। বিশেষত তার স্বামী রওশন প্রসঙ্গে আটচল্লিশের ভাষা আন্দোলন ও পরবর্তীকালীন জেলজীবন সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তাতে তার রাজনীতি চিনতে ভুল হবার জো নাই। *আরেক ফাল্গুন* উপন্যাসের ছাত্র-নেতৃবৃন্দ যে বিশেষ দলের সাথে যুক্ত, সম্ভবত কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে, তা তাদের চলাফেরা, কর্মসূচি এবং পারস্পরিকতা থেকেই বোঝা যায়। স্পষ্ট করেও বলা হয়েছে দু-একবার। সালমার ছোটো ভাই শাহেদ তার কাছে আসাদের পরিচয় জানতে চায়। ইউনিভার্সিটির ছাত্র শুনে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমাদের দলের লোক বুঝি?' সালমা অস্বীকার করলেও শাহেদ বলে, 'না বললেই হলো। আমি দেখলে চিনি নে যেন' (পৃ. ১৮৯)। আসলেই চেনা যায়। জহির রায়হান যে ভাষা আন্দোলনের এক প্রত্যক্ষদর্শীর প্রতিবেদন রচনা করতে গিয়ে মূল কেন্দ্র হিসাবে বামপন্থিদের দিকেই আলো ফেলেছেন, তাতে কোনো সন্দেহ নাই। প্রশ্ন হলো, এক জাতীয়তাবাদী বয়ানে কঠোর বামপন্থি কর্মীদের জান-বাজি-রাখা সক্রিয়তাকে লেখক কীভাবে আঁটিয়ে ফেললেন? বিপরীতক্রমে প্রশ্ন তোলা যায়, এ বাস্তবতার কারণে কি জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় কোনো বিশিষ্টতা সঞ্চারিত হয়েছে?

মুনিমের ফুফাতো বোন জাহানারার অধ্যাপক স্বামী একদিকে মুনিমদের আন্দোলনের সহমর্মী, অন্যদিকে রাজনীতির হালচাল সম্পর্কে তীক্ষ্ণভাবে সচেতন। তার সাথে মুনিমের কথোপকথনে রাজনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে বেশ পরিচ্ছন্ন ধারণা পাওয়া যায়। মুনিম এবং অধ্যাপক একমত হয়, নেতারা এ আন্দোলনে সমর্থন দেবে না। তারা কেবল ক্ষমতা-দখলের জন্যই রাজনীতি করে। তাদের লক্ষ্য রাজনীতিকে ব্যবহার করে আখের গোছানো। মুনিম বায়ান্নের স্মৃতিচারণে গায়েবি জানাজা আর 'সমুদ্রের মতো' মিছিলের কথা স্মরণ করে। তখনো 'নেতারা কেউ ছিলেন না'। আগের মতো এবারের আন্দোলনেও মুনিমরা নেতাদের সহযোগিতা চেয়েছে। কিন্তু ওরা ভয়ে পিছিয়ে গেছে। বিব্রত গলায় অনুরোধ করেছে, মুনিমরা যেন সাংঘাতিক কিছু করে না বসে। যেন শান্তি ভঙ্গ না করে। উনিশশ পঞ্চান্ন সালের এ আলাপের আগেই চুয়ান্নর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছে এবং তা বাতিলও হয়েছে। তবু, ওই সরকারের নেতৃবৃন্দের প্রতি এতটা নিরাসক্তি কেবল তখনি থাকতে পারে, যখন মতাদর্শিকভাবে তার সাথে বিরোধ থাকে।[৭]

গোপন রাজনীতির যেসব নমুনা এ উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে, তা থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, ছাত্রমহলের এ আন্দোলন-সংগ্রামে বামপন্থি ছাত্র-আন্দোলন খুব জোরালোভাবে হাজির ছিল; এমনকি তারাই ছিল নেতৃত্বের ভূমিকায়। কিন্তু এক্ষেত্রে অন্য একটি ঘটনা ঘটেছে। পার্টি-লাইন আর আন্দোলন এ দু'টোর মধ্যে পরিষ্কার ফারাক ঘটে গেছে। আন্দোলনের তুঙ্গ দশায় পার্টি-লাইন বেশ খানিকটা ধূসর হয়ে গিয়ে, বা মুলতুবি হয়ে গিয়ে বড়ো হয়ে ওঠে আন্দোলনের কর্মসূচি। এখানেও দেখা যাচ্ছে, পার্টি-লাইনের ভাষা পরিবর্তিত হয়ে জাতীয়তাবাদী আকার ধারণ করেছে। অধ্যাপক ও মুনিম দু'জনই নেতাদের যে ভাষায় দুষেছেন, তাতে শ্রেণি-রাজনীতির কোনো ইশারা নাই, দু'জনই বরাত দিয়েছেন দেশপ্রেমের আর দেশের মানুষের মুক্তির।

স্পষ্টতই এ ভাষা জাতীয়তাবাদী রাজনীতির। এভাবে বামপন্থা আর জাতীয়তাবাদী রাজনীতি একাকার হয়ে শেষ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী ভাষা-কাঠামোকেই উচ্চকিত করেছে।

তবে কার্যকারণ যাই হোক, বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নাগরিক পরিসরের যে প্রবল প্রাধান্য, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষার্থী-নির্ভরতা, বামপন্থি উপকরণের বাহুল্য– তার প্রভাব নিশ্চয়ই এখানকার সমকালীন ও পরবর্তী রাজনীতিতে পড়েছে। উনিশশ উনসত্তরে প্রকাশিত *আরেক ফাল্গুন*-এর ক্ষেত্রে হয়তো আক্ষরিক অর্থে পঞ্চান্ন সালের বাস্তবতা বজায় থাকেনি, কিন্তু আটচল্লিশ থেকে শুরু হওয়া ভাষা আন্দোলন এবং ভাষা আন্দোলনকেন্দ্রিক পরবর্তী জাতীয়তাবাদী রাজনীতি অন্তত গণ-অভ্যুত্থানের আগে পর্যন্ত এসব বৈশিষ্ট্য দ্বারা যে প্রবলভাবে প্রভাবিত ছিল, তার জোরালো পরিচয় পাওয়া যায় এসব সাহিত্যকর্মে।

৫

সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রায় প্রথম দিকের এবং প্রায় শেষ পর্যায়ের রাজনৈতিক সংবেদনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় *কবর* এবং *আরেক ফাল্গুন*-এ। ভাষা আন্দোলন এ সময়খণ্ডের সবচেয়ে প্রভাবশালী ঘটনা হওয়ায় এবং রাজনীতির অভিমুখ-নির্ধারক প্রধান ঘটনা হওয়ায়, এ আন্দোলনকেন্দ্রিক সাহিত্যকর্ম দুটিতে ওই সময়ের বাংলাদেশের রাজনীতি, রাজনৈতিকতা এবং রাষ্ট্রকল্পের কিছু বুনিয়াদি ধারণার প্রকাশ ঘটেছে। তাতে মুখ্যত এক নিপীড়ক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াইরত নিপীড়িত মানুষের ছবি পাওয়া যায়। 'আমরা' আর 'ওরা'– এ দুই সুস্পষ্ট ভাগের আওতায় দুই পক্ষের কর্মসূচি ও তৎপরতা চিহ্নিত হওয়ায় অন্তত নিপীড়িত পক্ষের রাজনীতি যে সম্পূর্ণরূপে জাতীয়তাবাদী চরিত্র পরিগ্রহ করেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নাই।

দুটি টেক্সটেই নিপীড়ক রাষ্ট্রের যে প্রতিচ্ছবি নির্মিত হয়েছে তাতে আধুনিক, গণতান্ত্রিক ও মানবিক প্রত্যয়গুলোর অনুপস্থিতিই প্রধান হয়ে উঠেছে। এ রাষ্ট্রের বিপরীতে সংগ্রামরত মানুষের মধ্যে পাওয়া যায় ওইসব সংবেদনশীলতা, যেগুলোকে এক নামে গণতান্ত্রিক-বুর্জোয়া রাষ্ট্রের মূল্যবোধ বলতে পারি। কাজেই পার্টি-সংগঠন ও কর্মসূচির মধ্যে প্রত্যক্ষত উল্লিখিত না হলেও প্রকল্পিত রাষ্ট্রকে এ নামেই চিনতে পারা যায়।

জাতীয়তাবাদী আবেগ-অনুভূতিতে জোরারোপ সত্ত্বেও দুটি টেক্সটই নিজ নিজ ধরনে জাতীয়তাবাদী সংকীর্ণতা কাটিয়ে ওঠার ব্যাপারে তৎপর ছিল। *কবর* নাটকে তেতাল্লিশের মন্বন্তর-প্রসঙ্গ এবং মুর্দা ফকিরের জীবন-মৃত্যুর নতুন সংজ্ঞায়ন ওই প্রসারতার দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তুলনামূলক 'অধিক জাতীয়তাবাদী' টেক্সট *আরেক ফাল্গুন* একদিকে উর্দুভাষী চরিত্রকে আত্মীকৃত করে রাজনৈতিকতার সীমা প্রসারিত করে, অন্যদিকে আবার নাগরিক মধ্যবিত্ত আবহে বিকশিত নতুন প্রজন্মের বড়ো প্রেক্ষাপটকে উচ্চকিত করার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিকতার অনুভূতিতে ভিন্ন মাত্রা সঞ্চারিত করে। দুটি টেক্সটই পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাবাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলাম-প্রশ্ন নিয়ে নিজের আওতার মধ্যে লিপ্ততা দেখিয়েছে।

তবে মধ্যবিত্ত-নির্ভরতা এবং বিশেষত ছাত্র-নির্ভরতা দুটি রচনার ক্ষেত্রেই আন্দোলন-সংগ্রামের এক দুরপনেয় ঘাটতির ইশারা দেয়। তাছাড়া, বামপন্থা ও বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কোনো সন্তোষজনক মীমাংসাও এসব রচনায় প্রস্তাবিত হয়নি। দু'টো রচনাই পাঠককে এমন ভাবতে প্রলুব্ধ করে যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রে গোপন রাজনীতিতে বাধ্য হওয়া বামপন্থিরা 'রাষ্ট্র-বিরোধী' কর্মসূচিতে নিজেদের মতো করে অংশ নিয়েছে এবং নেতৃত্ব দিয়েছে; তবে সামগ্রিক ভাব-ভাষায় জাতীয়তাবাদী প্রচণ্ড টান তাদের কর্মকাণ্ডকে শেষ

পর্যন্ত আকারে-প্রকারে জাতীয়তাবাদী সুরত গ্রহণে বাধ্য করেছে। এ ব্যাপারে লেখকদের বিশেষ আপত্তি হয়তো ছিল না। তার এক প্রমাণ এই যে, 'রাষ্ট্রভাষা' দাবির তুলনামূলক সূক্ষ্ম এলাকা পরিহার করে দুটি টেক্সটই 'মায়ের ভাষা' লব্জ ব্যবহার করেছে, আর রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের মূল ক্ষেত্র হিসাবে 'মায়ের ছেলে' বর্গটিকেই উচ্চকিত করেছে। একুশে ফেব্রুয়ারি-আন্দোলনে দাবির বৈচিত্র্য যতই থাকুক, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক দিগন্তে তার দাবি যতই প্রসারিত হোক, পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী সুর সেখানে প্রধান হয়ে উঠতে এক মুহূর্তও দেরি হয় না। আলোচ্য টেক্সট দুটিও বস্তুত গভীরভাবে তারই সাক্ষ্য বহন করছে।

টীকা

১. *কবর* নাটকের পৃষ্ঠা-সংখ্যা নির্দেশিত হয়েছে (চৌধুরী, ১৯৮২ থেকে)।

২. *আরেক ফাল্গুন* উপন্যাসের পৃষ্ঠা-সংখ্যা নির্দেশিত হয়েছে (রায়হান, ২০০৯ থেকে)।

৩. ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক বিবরণীগুলোর সাথে মিলিয়ে পড়লে দেখা যায়, *আরেক ফাল্গুন* মোটামুটি বিশ্বস্তভাবে আন্দোলনের ঐতিহাসিকতা রক্ষা করেছে। (বানু, ২০০৮)

৪. মুনীর চৌধুরী নিজেই *কবর* নাটকের বাড়তি তাৎপর্য নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'শুধুমাত্র কবর নাটকটিতে একুশের তাৎপর্য খোঁজা হলে খানিকটা ভুলই বরং করা হবে। হয়তো আরো বেশী কিছু বলার চেষ্টা করেছি আমি।' (ইমাম, ১৯৭৭, পৃ. ১৩৫) এটা খুবই সম্ভব যে, নাট্যকার এখানে নাটকে প্রতিফলিত ভাবাদর্শিক দিকের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

৫. 'আমাদের মাইক্রোফোনে উর্দুতেও বক্তৃতা দেওয়া হতো। পরিষ্কারভাবে বুঝানো হয় যে উর্দুভাষার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই নয়, আমাদের দাবী বাংলাভাষার স্বীকৃতির জন্য, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য।' [আবুল মাল আবদুল মুহিতের স্মৃতিচারণ, সলিমুল্লাহ হলের সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা (৫৬-৫৮ পৃ.) থেকে উদ্ধৃত, বানু, ২০০৮, পৃষ্ঠা, ২৮৪]।

৬. *কবর* নাটকটি বামপন্থি বিপ্লবী রাজনীতির পটভূমিতে পাঠ করেছেন অনেকেই এবং স্বভাবতই সে কাঠামোয় খাপ খাওয়াতে না পেরে হতাশ হয়েছেন (দ্র. জয়নুদ্দীন, ১৯৯৮, পৃ. ৫৬)। বস্তুত, প্রতিরোধ-আন্দোলনের কর্মীদের অনেকেই নানামাত্রায় কম্যুনিস্ট আদর্শের সাথে যুক্ত ছিলেন– এ বাস্তবতার বাইরে নাটকের ভাবাদর্শগত দিক থেকে ওই আদর্শের সাথে সংযুক্তি দেখানোর সম্ভবত উপায় নেই।

৭. সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দের সাথে একশ চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙার বিষয়ে ছাত্রদের যে মতবিরোধ হয়েছে, সে কথা ভাষা-আন্দোলনের প্রায় সব বিবরণীতেই পাওয়া যায়। জহির রায়হানের উপন্যাসে এ বিরোধ সরাসরি জাতীয় নেতৃবৃন্দের দিকে গেছে।

তথ্যসূত্র

আজাদ, হুমায়ুন (২০১২)। 'একুশের চেতনা ও তিন দশকের উপন্যাস'। *নির্বাচিত প্রবন্ধ*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

আহমদ, সহুল (২০২০)। *জহির রায়হান: মুক্তিযুদ্ধ ও রাজনৈতিক ভাবনা*। ঢাকা: গ্রন্থিক প্রকাশন।

ইমাম, আলী (১৯৭৭)। 'কবর' প্রসঙ্গে মুনীর চৌধুরীর সাক্ষাৎকার *থিয়েটার*। রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত, ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঢাকা।

ইসলাম, রফিকুল (১৯৭২)। *মুনীর চৌধুরীর জীবনকথা*। মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, আনোয়ার পাশা, আকরম হোসেন সম্পাদিত। বাংলা বিভাগ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ইসলাম, রফিকুল (২০১৬)। *বাংলাদেশের সাহিত্যে ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

চৌধুরী, মুনীর (১৯৮২)। *কবর*, *রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, আনিসুজ্জামান সম্পাদিত। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

জয়নুদ্দীন, মোহাম্মদ (১৯৯৮)। *মুনীর চৌধুরীর সাহিত্যকর্ম*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

বানু, আরজুমন্দ আরা (২০০৮)। *শহীদুল্লা কায়সার ও জহির রায়হানের কথাসাহিত্য: বিষয় ও প্রকরণ*। ঢাকা: অনিন্দ্য প্রকাশ।

বিশ্বাস, সুকুমার (১৯৮৮)। *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

রায়হান, জহির (২০০৯) [১৯৮০]। *রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ। আশ্‌রাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত। ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস।